উপসংহার

আমরা এই গবেষণাপত্রের ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছিলাম বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চার দীর্ঘ ইতিহাসের কথা। সে ইতিহাস হাজার বছরের। বাংলা কাব্যচর্চা বলতে সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও বাংলাদেশের ঢাকার কথাই প্রথমে উঠে আসে। বাংলাদেশের সরকারি ভাষা বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বিষয়টা অনুরূপ। কিন্তু উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস যে বেশ পুরোনো একথা অনেকেই মনে রাখেন না। ভারতের এই উত্তর-পূর্ব অংশের আটটি রাজ্যে মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাংলাভাষীই সবচেয়ে বেশি, যদিও এই অঞ্চলে বাঙালিদের কোনো রাজ্য নেই। ত্রিপুরায় এখন বাঙালিরই সংখ্যাধিক্য। কিন্তু ওই রাজ্যটি ভাগ হয়েছিল ত্রিপুরি জনগোষ্ঠীর জন্য। উত্তর-পূর্বের এই বাঙালিদের সম্পর্কে কবি-সম্পাদক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন, এঁরাই হচ্ছেন সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন। তাঁর মতে, প্রথম ভুবন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হলো দ্বিতীয় ভুবন। এই ত্রিপুরায়ই রাজ আমলে বাংলাভাষায় কাব্যচর্চার নিদর্শন রয়েছে প্রায় পাঁচশ বছর ধরে। অসমেও দেখা যায় যে প্রায় দেড়শো বছর আগেই সৃষ্টি হয়েছিল আসাম মিহির, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তিনটি পত্রিকা— এঁদের প্রকাশস্থল যথাক্রমে গুয়াহাটি, ধুবড়ি ও গোয়ালপাড়া।

ভারতের মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা হয়— এই মিথ এখন অচল হয়ে যাচ্ছে। অসমের দুই উপত্যকা অর্থাৎ বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অত্যন্ত শক্তিমান কবিরা উঁচুমানের কবিতা লিখছেন তার প্রমাণ মেলে যে কোনো সাহিত্যপত্র হাতে নিলেই। কলকাতা, শিলিগুড়ি, আসানসোল, রাঁচি, ভূপাল, জবলপুর— যেখান থেকেই বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হোক না কেন, তাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে অসমের কবির কবিতা থাকবেই। অসমের বাংলা কবিতার পটভূমি-চরিত্র, সুখ-দুঃখ, ভঙ্গি বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এমন সব নতুন দিকের প্রবর্তনা করেছে, যা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

এতদিন ধরে অসমে বাংলা কবিতা লেখা হচ্ছে এখানকার কবি ও নিয়ে গবেষণার প্রায় নেই বললেই চলে। এজন্য আমরা গবেষণার বিষয় স্থির করেছি— অসমের বাংলা কবিতা (১৯৬০-২০০০) : একটি বিশ্লেষণী পাঠ।

এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো চোখে পড়েছে তার মধ্যে আমাদের প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিতা চর্চার কথা। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রহ্মপুত্র পারে বৌদ্ধিক বাঙালি এসেছিলেন ইয়ান্ডাবু চুক্তির হাত ধরে। সেটা ছিল ১৮২৬ সাল। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলের বাংলা চর্চার ইতিহাস সাকুল্যে দুশো বছরও নয়।

এমন নয় যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন শুধু এ অঞ্চলের বাঙালিরা। কর্মসূত্রে বা দেশভাগের বলি হয়ে অনেকেই এ অঞ্চলে এসে কবিতা লিখেছেন। অনেকে কিছুদিন এখানে কবিতাচর্চায় আবিষ্ট থেকে ফিরে গেছেন নিজের জন্মভূমি এমন নিদর্শনও কম নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় জন্মেছেন শুধু সেই সব কবিদের নিয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং দেখতে চেয়েছি অন্য কোথাও জন্মালেও এই অঞ্চলে বসে বা এসে যাঁরা কবিতা চর্চা করেছেন তাঁদেরকেও।

বিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিরা অন্তত ১২৫টি কবিতার বই প্রকাশ করেছেন। ধুবড়ি থেকে সদিয়া— সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে বাংলা লিটল ম্যাগাজিন। সেখানে আলো করে রয়েছে কবিদের লেখাজোখা— যা আমাদের গবেষণার বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

তবে এ কথাও এখানে প্রযোজ্য যে এই শিরোনাম দেখে অনেকেই প্রশ্ন তুলতেই পারেন যে এভাবে খণ্ডিত ভৌগোলিক অবয়বে সাহিত্যকে দেখা ও পড়ার কোনো অর্থ আছে কি?

কবিতার বিভাজন হয় না। কখনো কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় একে আবদ্ধও করা যায় না— এটাই ধ্রুব সত্য।

তবু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা অসমের কবিতা আলাদা করে পড়তেই হবে, তার যুক্তি হিসেবে বলা যায়—

১. এই ভূখণ্ডে যে বাংলা কবিতা-চর্চা চলছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে লুইত পারের বাংলা কবি ও কবিতা-চর্চার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস অত্যন্ত জরুরি ও প্রাসঙ্গিক বলে আমাদের মনে হয়েছে।

২. পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ ছাড়া বাংলা কবিতা-চর্চা হয় ত্রিপুরা এবং অসমের বরাক উপত্যকায়, এরকম এক ভ্রান্ত ধারণা বাঙালি পাঠক মাত্রেই বর্তমান। সেই ধারণারও অবসান ঘটাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা কবিতা— এ আমাদের বিশ্বাস।

অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যচর্চা মূলত লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক। যাঁরা এ-অঞ্চলে সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং করছেন তাঁদের একমাত্র ভরসা এই ছোট পত্রিকাগুলোই। তাই স্বভাবত এখানকার সাহিত্যচর্চার কোনো বাণিজ্যিক প্রচার ও প্রসার নেই। লুইত পারের কবিরা ছোট পত্রিকার সৃষ্টি— তাঁরাই এখানকার বাংলা কাব্যচর্চার কাণ্ডারী। লিটল ম্যাগগুলিই সজীব করে রেখেছে লুইত পারের বাংলা কাব্যচর্চার ধারাবাহিকতা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকেই এই ধারা অব্যাহত রয়েছে— যা আজও অমলিন।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে অসমের ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকায় বাংলা সাহিত্যচর্চা ছিল মূলত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গুয়াহাটি শাখা (বহির্বঙ্গে এটি সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় শাখা, প্রতিষ্ঠা ১৯১১ সাল-অধুনালুপ্ত), কটন কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, আর্য নাট্যসমাজই ছিল মুখ্য। এ ছাড়া ছিল অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার নানা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বাংলাচর্চার অনুশীলন। এবং ছিল যৌথ পরিবারের আঙিনায় হাতে লেখা পত্রিকার চল। আর ছিল অসমিয়া ও বোড়োভাষী মানুষের বাংলাচর্চার ধারা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে, বিভাজিত দেশে উদ্‌বাস্তু মানুষের ঢল নামতে থাকে। আগে বাঙালিরা মূলত এ-রাজ্যে এসেছিল ব্রিটিশ শাসনের সূত্রে। কিন্তু দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় উদ্‌বাস্তু হয়ে এ দেশে, এ উপত্যকায় বাঙালিরা এসেছে বন্যার জলস্রোতের মতো। ভাঙা মন, নতুন স্বপ্ন নিয়ে বাঙালিরা 'নতুন' দেশে এসেছেন।

কবিতাতেও এ কথা প্রকাশ পেয়েছে—

'পরকে যারা আপন করে
বুকে আকুলিয়াই লয়
সকলের তরে অবারিত দ্বারা চিত্ত অসংশয়
তাদের কে বা আপন, কে বা পর—
যেখানে আকাশ মাটি জল
আমায় দিয়েছে নতুন বাসস্থল
সে যে আমার চির চেনেহী আশ্রয়দাত্রী
চির মরমর দেশ নতুন মাতৃভূমি।'

বাঙালিরা এখানে ক্রমশ থিতু হতে থাকে। চণ্ডীমণ্ডপের আদলে তৈরি হয় কালীবাড়ি, কালীবাড়ির প্রাঙ্গণেই প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্যালয়— এভাবেই ক্রমশ অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বঙ্গভাষীরা নিজেদের জন্য তৈরি করে নেয় এক 'নতুন' ভূমি। অবশ্য এক্ষেত্রে স্থানীয় অসমিয়া, বোড়ো, রাভা, মিচিং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর উদার মনোভাবও উল্লেখযোগ্য। সে যাই হোক সব মিলে স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা এই আলো হাওয়ায় নিজেদের পূজা-পার্বণ, সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে বেশ মানিয়ে নিচ্ছিল।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ডিব্রুগড়, গুয়াহাটি, ধুবড়ি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বেশ কিছু বাংলা পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছিল। এই পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়েই সে সময়কার বাংলাচর্চার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডিব্রুগড়ের 'চলোর্মি', 'সীমান্তের বাঁশী', গুয়াহাটির 'সূর্য', গৌরীপুরের 'প্রান্তবাসী' কাগজ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক এই পত্রিকাগুলিই ছিল এখানকার বাংলা চর্চার অন্যতম পৃষ্ঠভূমি। উল্লেখ্য যে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা করার বিরুদ্ধে এ-সময়েই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল— বরাক উপত্যকায় শহিদ হয়েছিলেন ১১জন ভাষাপ্রেমী মানুষ। এই ঘটনার কিছুকাল পরই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়— ১৯৬২ সালে। বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষার দ্বারা উন্মোচিত হওয়ার পাশাপাশি বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে থেকে আরও কিছু পত্রিকা পাওয়া যায় — যেগুলি স্বতন্ত্রতার দারি রাখে। এ সময়েই ঊর্ধ্বেন্দু দাশ, জীবন নাথ, রবীন্দ্র সরকার প্রমুখ কাব্যচর্চা শুরু করেন। প্রসঙ্গত বলা ভালো, ষাটের দশকেই এখানকার বাংলা কবিতা কৈশোর থেকে যাত্রা শুরু করে। অন্যদিকে বরাক উপত্যকায় এ সময়ে কাব্যচর্চার 'ধুম' লেগেছিল— শক্তিপদ, বিজিৎ, উদয়ন, বিমল, শান্তনুদের নেতৃত্বে। প্রকাশিত হয়েছিল 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' সংকলন। 'দেশ' পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'এ সময়ের শক্তিমান কবি দল।' বরাকের মতো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এমন কোনো শক্তিশালী কবিগোষ্ঠীকে সে সময় দেখা যায়নি। বলা ভালো, আজও তার সঠিক পদধ্বনি আমরা শুনতে পাইনি।

'সত্তরের দশক মুক্তির দশক'। রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রভাব পড়েছিল কবিতা ও সাহিত্যে। দেখা দিয়েছিল মিনি পত্রিকা— শুরু হয়েছিল নানামুখী সাহিত্যস্রোত। এ সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল 'ফিন্‌কি',

‘পাঁক ঘেঁটে পাতালে’, ‘রেনেসাঁ’, ‘অধুনা’, ‘একা এবং কয়েকজন’-এর মতো ছোট কাগজ। এই পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়েই এখানকার বাংলা কাব্যচর্চার প্রকাশ ঘটতে থাকে। এবং এভাবেই ক্রমশ আমরা পেয়ে যাই আশি ও নব্বইয়ের দশকে তপন রায়, গৌতম মিত্র, সঞ্জয় চক্রবর্তী, রতন ভট্টাচার্য, সুব্রত চৌধুরীদের। ‘উৎস ধ্বনি,’ ‘প্রাচীধরিত্রী’, ‘পত্রপুট’, ‘মাজুলি’, ‘মহাবাহু’ প্রভৃতি কাগজ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ-অঞ্চলের কবিতায় দেখা দেয় তারুণ্যের রং। রতন ভট্টাচার্যের কবিতায় পাই—

এই আকাশ বাতাস তোমার নয়, সামসেন—
নয় এই জল, মাটি, রোদ্দুর।
জরুরি এই তারবার্তা পৌঁছে দিতে,
গা ছম্-ছম্ যুবতী রাতে ছুটে আসে—
রণাঙ্গনে,
উন্মাদ সৈনিকের দল।
অতলান্ত গভীর পৈশাচিক উল্লাসে,
ইস্পাতকঠিন দুটি তরবারি হাতের সাহারা তৃষ্ণায়,
দিয়ে গেছে তোমায়।
অবেলার ঘুমের জীবন।
চাউল খোয়া চাপরির বিদেশী বাতাসে
উৎকট গন্ধ পাঁচ স্বদেশী মাংসে
আর্দ্র লাল মাটিতে ক্ষুধার্ত শকুনের মিছিল।
চাপরির কুঁড়ে ঘরে ভাঙাচোরা সামসের
শয়নকক্ষে,
অভিমান মুখে কোরাসের গন্ধ—
চির চেনেহী মোর ভাষা জননী
প্রিয় সামসের ক্ষমা করো, ভাবছি—
তোমায় নিয়ে একটা কবিতা লিখব।

— কবিতায় বিষয় হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলের ঘটনা। এই ভাবনাকেই সঞ্জয়রা আরও পরিশীলিত ও পরিণত ভাবনায় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন— যা একান্তই লুইত পারের কবিতার নিজস্ব সুর। যে সুরে অমলেন্দু গুহ নিজেকে সমর্পণ করেছেন, সেই সুরই এ-অঞ্চলের বাঙালি কবিদের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে।

নব্বই ও শূন্য দশকে দীপিকা বিশ্বাস, শিবাশিস চট্টপাধ্যায় নিখিল তালুকদার, অভিজিৎ চক্রবর্তী,

কল্লোল ভৌমিক, চিন্ময়কুমার দাস প্রমুখ কবি তাঁদের কাব্যভাষায় নির্মিত করেছেন সময়ের ছবি। মানসিক দ্বিধা-যন্ত্রণা সামগ্রিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে তা হয়ে উঠেছে নির্মোহ একেকটি রূপ। বর্তমান সময়ে এ-অঞ্চলের কবিতা ও কাব্যচর্চা এক নিঃশব্দ জাগরণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। লুইত পারের কবিতায় নির্মিত হয়েছে 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে'র খেলা, যা এ অঞ্চলের বাংলা কবিতার নিজস্ব সম্পদ। এই বৈশিষ্ট্যেই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে এখানকার বাংলা কবি ও কবিতা।

দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকা ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালি অধ্যুষিত। কাছেই সীমান্ত এবং তারপরই বাংলাদেশ। এই অঞ্চলে কবিতচর্চার ইতিহাস বেশ পুরোনো। দেবেন্দ্রকুমার পালচৌধুরী, অশোকবিজয় রাহা, সুধীর সেন, মৃণালকান্তি দাশ, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, অনুরূপা বিশ্বাস, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিৎ ভট্টাচার্য, শান্তনু ঘোষ প্রমুখ বরাকপারে বসে কবিতাচর্চা করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর একমাত্র কবিতা সংকলন 'সীমান্ত প্রহরী' উৎসর্গ করেছিলেন 'মণিপুরের পর্বকেশরী বন্ধু ইরাবত সিং-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে', পরবর্তীকালে বরাকের কবিদের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে। মনোতোষ চক্রবর্তী যেমন লিখেছেন—

আজ হাস্যোজ্জ্বল মিজো তরুণীরা
রঙিন পোশাকে ঝলমল— বার্মিজ ছাতাটি মেলে
নেমে আসুক না আমাদের সান্ত সমতলে, আজ
সমস্ত বৈরী সাজ ত্যাগ করে মিত্র হাত প্রসারিত করো।

প্রতিবেশী রাজ্য মিজোরামের কথা সাবলীলভাবে কবিতায় উঠে এসেছে মনোতোষ চক্রবর্তীর হাত ধরে। এরকম উদাহরণ আরও আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'সীমান্ত প্রহরী'র কথা। এই কাব্যগ্রন্থের কবি 'মা তুমি শিগ্‌গির ফিরে এসো'— কবিতায় দেখিয়েছেন পাহাড়ি সৌন্দর্যের দৃশ্য।

"পাইনবনে শীত-ভালুকের
গা-কাঁপুনি গোঁ গোঁ থেমে গেছে ;
চিকন পাতার তারে বেজে উঠেছে স্প্যানিশ গিটার।

বৈরাগ্যের বরফে ঢাকা
নগরীর কুমারী বুকে
পুষ্পধনু শর হেনেছে ;
পত্রহীন শীর্ণ নাসপাতির ডালে ডালে
অফুরন্ত ফুলের সমারোহ।
এপ্রিল সকালে সোনালি রোদের ঢল নেমেছে।"

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতই সুধীর সেনের কাব্যেও দেখি বরাকের নিসর্গের ছবি। বরাক উপত্যকার অগ্রজ

কবিদের মধ্যে সুধীর সেন প্রথম বৃহত্তর সাহিত্যের জগতে আধুনিকতার বীজ বপন করলেন। তিনি সরাসরি বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে কিংবা জীবনানন্দ প্রমুখের আধুনিকতাকে মেনে নিতে না পারলেও তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি। পরই চিত্র ফুটে উঠেছে 'পাখির সংসারে' কবিতাটিতে।

"শেষ রাতে ঘুম ভাঙে প্রতিবেশী মোরগের ডাকে,
চালের ওপরে কাক হাঁটে-থপথপ, কা-কা সংলাপে মুখর।
আড়মোড়া ভেঙে উঠি। জল পাইরঙে হাসে ভোর—
কুয়াশার শাল গায়ে কে বাজায় সাতরঙা সুরের লহর।

খঞ্জন উঠোনে নাচে, ফরিঙের পিছে ডাহুক-মিথুন,
তিন টিয়ে আমের পাতায় মিশে ক্যাঁক কাঁক নিজেরে জানায়,
চড়ুইয়ের টুই টুই, গাছে ফিঙে দোয়েলেরা, অজানা পাখিরা,
শলিকেরা ওড়ে-বসে, একধারে কাক-ফিঙে কলহ জমায়।"

বরাকের জনপ্রিয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। বাস্তবমুখী হয়েও অসাধারণ রোমান্টিক। তাঁর কবিতায় কান পাতলে শুনি—

তুমি আমার ঘুর ভাঙা ভোর বাউল কণ্ঠে 'রাই জাগো'
গান তুমি আমার খয়রাতী দান রেশন-চালের পাথরকুচি
দূর-বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা সাঁকো
তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ
ওপর-আলোর খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি আমার।

জীবনকে এমন করে দেখার এই বিপ্রতীপ প্রয়াস বরাক উপত্যকায় একেবারেই নতুন আর এই নতুনত্বে জড়িয়ে থাকা তির্যক বাচনভঙ্গি আধুনিকও। তাঁর ছন্দজ্ঞান অপরিসীম।

'অতন্দ্র' থেকে তাঁর জয়যাত্রা শুরু। ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত এ উপত্যকার ছোট পত্রপত্রিকায় শক্তিপদ ব্রহ্মচারী 'মনসামঙ্গল' কবিতাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বরাক উপত্যকা এবং বহির্বঙ্গেও। লোকায়ত জীবনের ঐতিহ্য নিয়ে 'মনসামঙ্গল'-এ কবি লিখেছেন— 'কুপি লম্পে রাতকানা নিরক্ষর বুড়ি'র করুণ ছবি—

সপ্তডিঙ্গা মধুকর চারিদিকে জল
শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসা-মঙ্গল
পচাপাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা
ছেঁড়া কাঁথা-কানি আর বেহুলা যন্ত্রণা

হু হু করা কাল সন্ধ্যা ভেসে আসা গানে

সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে

অতন্দ্র বৃত্তের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি বিমল চৌধুরী। আমরা লক্ষ করেছি ঐতিহ্য এবং বহমান সময়ের দিকে মুখ রেখে কবি সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর কবিতার ঘরবাড়ি জুড়ে রোদ্দুর আর ছায়ার লাবণ্য ঝলমল।

তুলসীর মঞ্চ ঘেঁষে পূবদিকে ডালিমতলায়

রক্ষণীয় হুলুধ্বনি সমবেত মঙ্গল, মঙ্গল

হিমেল হেমন্ত সন্ধ্যা সেদ্ধধানে ম ম উঠোনের

মাঝখানে বিছানো শীতল পাটি টুঙটাঙ কথা

হাতে হাতে গুয়া পান রসসিক্ত স্বাগত জীবন। (আমার জন্ম)

সমাজ এবং সংস্কৃতির মাঙ্গলিক চিহ্ন প্রকৃতি-ঘেঁষা আঞ্চলিক জীবনকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাকৃত জীবনের অনুভব-স্পন্দনে তাঁর কবিসত্তার সুর-তাল-লয়-গাঁথা। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়—

উজ্জ্বল নক্ষত্রাবলী ক্ষোভহীন গভীর আ

ভেসে আসে স্মরণের মুগমদ চন্দন সুবাস। (চতুর্দশপদী)

উদয়ন ঘোষ ছিলেন অতন্দ্র পরিবারের মেধাবী লেখক, তাই তাঁর কাব্যভাষা পেয়েছিল অনন্য ব্যাপ্তি যার ফলে বৃহৎ কাব্যভুবন সখা বা সখীরূপে সেই সময় বরবক্র নদী তীরে বসতে, ভাব বিনিময় করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেনি।

উদয়ন ঘোষের কবিতা—

গাছের মগডালে উঠে উঁকি মেরে দেখি

রবীন্দ্রনাথের কোনো জ্যোৎস্নালোক এখানে

পৌঁছুতে পারে কিনা

হাত থেকে ছিটকে পড়ে রবীন্দ্র রচনাবলী, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ কাদায় জড়িয়ে

তবু বলতে চেষ্টা করি বিষ্ণু দে'র চোখ দুটি ধার দিতে পার আই ব্যাঙ্ক?

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন সচেতন কবি। প্রখরও বলা যায়, হয়তো প্রবন্ধিক ডঃ রমা পুরকায়স্থের সুরে বলা যায়— 'প্রাকরণিক বিন্যাস দিয়েই তিনি কবিতার সময়কে ধরতে চেয়েছেন। তাই বিষয়ের চেয়েও আঙ্গিক তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতায় যখন আধুনিকতার ছাতা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল ঠিক তখনই বৃহত্তর বঙ্গসাহিত্যের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রকরণবাদী শ্রুতি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক কবিতা-বিশ্ব তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা ও প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা আর তাই লক্ষ করি বরাক উপত্যকার অন্যান্য কবিদের থেকে ভিন্ন তাঁর পথ ও পাথেয়।'

শান্তনু ঘোষও ছিলেন লেখাকর্মী পরিবারের অন্যতম একজন কবি। যাঁর কবিতার অনন্য ব্যাপ্তির ফলে বৃহৎ কাব্যভুবন বন্ধুরূপে সেই সময় বরাক তীরে বসতে, ভাব বিনিময় করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। শান্তনু ঘোষ লিখেছেন—

শরীরের ভিতরে চলে গেছে, দিবসরজনীসখী
শোনা যায় কি ডাক্তারের পদধ্বনি তোমার বুকের
গভীরের নিশীথ বেলায়
রাত্রি হলে আমি আসি, তোমার জানালায়
কুয়াশায় সজ্জিত কেশবাস, আমি কান পেতে রই, শুনি
ঝিল্লিরব, আমি আভূমি নত
তোমার পায়ের আশে পাশে, কেশচূড়ে ঐ ধুতরো ফুল বেঁধে
আমি আছি তোমারি কাছাকাছি,
তুমি-ই আমার কৌতুক, আমার বিষাদ, হে
আমার বরাক কিংবা ব্রুকলীন ব্রিজের শহর।

(বরাক কিংবা ব্রুকলীন ব্রিজের শহর)

বরাক উপত্যকায় ছোট পত্রিকার জন্ম আজও অব্যাহত, অব্যাহত এই পত্রিকার মধ্য থেকে নতুন কবিদের উঠে আসা তবে তার লালন পালন আর বিকাশ-সহায়ক নিবিড় ও নিভৃত পাঠক এবং পারিপার্শ্বিকতা বন্ধুত্বপূর্ণ না হলে কবিকে বড়ই রক্তাক্ত হতে হয়, কবিতার তখন বড় অভিমান হয়।

অনুকূল-প্রতিকূল ঝড়-ঝঞ্ঝা সবকিছুর পরও বলা যায়, কবিতা নির্ঝরিণীর মতোই বয়ে চলেছে আরোগ্যবার্তা নিয়ে। তারুণ্য ভরপুর কবিরা চিরকালই ছিলেন, চিরকালই আছেন, চিরকালই থাকবেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় অসমের বাংলা কবি ও কবিতা (১৯৫৫-২০০০), একটি বিশ্লেষণী পাঠ। এই পর্যন্ত আমরা অসমের দুই উপত্যকার ব্রহ্মপুত্র-বরাকের কবিতার ধরন আলোচনা করেছি। এবার এই দুই উপত্যকার কবিদের কবিতার বৈশিষ্ট্যের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রযোজ্য বলে বোধ হয় আমাদের।

প্রথমেই তাকাব হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতার দিকে। তিনি অবিভক্ত অসমের রাজধানী শিলং নিয়ে কবিতা লিখছেন, যার নাম 'শিলঙের চিঠি'। নামটি দেখেই বোঝা যায় কবি স্থানিকতার বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে যেতে পারেননি। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে—

"এখানে স্তরে স্তরে উত্তুঙ্গ সবুজ
গাঢ় নীল
গাঢ় ঘন নীল হয়ে
কালো মেঘ লীন।

.....

তৃষাত্তপ্ত রজস্বলা

লুইত উপত্যকায়!

তোমার চিঠি এল :

নীলখামে মোড়া

লাল আখরের অভিমান

ফসলের স্বরলিপি।”

— কবিতাটিতে কবি যেমন শিলঙের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। তেমনি আবার লুইতের পারে যে ভ্রাতৃঘাতী হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল, তা-ও ফুটে উঠেছে এখানে।

আবার লুইত পারের সবচেয়ে অগ্রজ কবি অমলেন্দু গুহের ‘বিহু’ কবিতায় অসমের মূল উৎসব বিহুর দৃশ্য ফুটে উঠেছে। যা কি না কেবল লুইত পারের বাসিন্দা কবিই এত নিখুঁত করে সাজিয়ে তুলতে পারেন। কবি এভাবে শুরু করেছেন—

দৃঢ়ঊরু মেয়েদের পদপাতে নেচে ওঠে ঢেঁকি

মায়ে-ঝিয়ে ধান ভানে গাসে গানে, সোনা হেন ধান—

এ ধানে বছর বুঝি কাটবে না। দুরুদুরু মন

মায়ের, ঝিয়ের তবু উড়ু-উড়ু মন আনচান।

— এ ছবি কেবল লুইতের ধারা যাঁর রক্তে প্রবাহিত তিনিই লিখতে পারেন।

এই কবিই তাঁর স্থানিক বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট করে দেন—

‘আমার নিবিড় শান্তির নীড় আসাম’— লিখে।

বরাকের অত্যন্ত জনপ্রিয় ও শক্তিমান কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী। বাস্তবমুখী হয়েও অসাধারণ রোমান্টিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘অতন্ত্র’-থেকে তাঁর জয়যাত্রা শুরু হয়। শক্তিপদের রচিত ‘মনসামঙ্গল’ এখন মিথ-এ পরিণত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ‘কুপি লম্পে রাতকানা নিরক্ষর বুড়ি’-র এক মানবিক করুণ ছবি তুলে ধরেছেন।

আবার বরাকের এই জনপ্রিয় কবি যেমন বাংলা ভাষা রক্ষার্থে আন্দোলন নিয়ে লিখেছেন—

“ দশটি ভাই ম্পো আর একটি পারুল বোন

কলজে ছিঁড়ে লিখেছিল এই যে ঈশান কোন—

কোন ভাষাতে হাসে কাঁদে কান পেতে তা শোন।”

তেমনি আবার অসম আন্দোলনের মতো ভ্রাতৃঘাতী হামলাও তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি লিখেছেন—

যে কেড়েছে বাস্তুভিটে, সে-ই কেড়েছে ভয়

আকাশজুড়ে লেখা আমার আত্মপরিচয়।

হিংসাজয়ী যুদ্ধে যাব, আর হবে না ভুল

মেখলা-পরা বোন দিয়েছে একখানা পান-তাম্বুল

শেষ লাইনটিতে তিনি প্রফুল্ল আর ভৃগুকে তাঁর 'খুল্লতাত ভাই!'— বলে নিজেকে হিংসাজয়ী যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করেছেন।

আবার লুইতপারের কবি ঊর্ধ্বেন্দু দাস অত্যন্ত সমাজমনস্কতা নিয়েই কবিতা লিখেছেন। নাগরিক জীবনের অবিসংবাদিত ক্লান্তি কবিকে একাকী অন্ধকারের যাত্রী করেছে। ঊর্ধ্বেন্দুর 'সাকিন আসাম ১৯৮৩' ইতিমধ্যেই ইতিহাসের পাতায় পা রেখেছে। বহিরাগত তাড়াও আন্দোলনের শেষটা ছিল বাঙালি মুসলমান মারো। ঊর্ধ্বেন্দুর সমাজমনস্কতা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়—

'ভগ্নস্তূপের মাঝে এই পরিত্যক্ত গাঁয়ের চাতালে

আশি বছরের পোড়া রূপের দেমাক নিয়ে শুয়ে আছে আমার নানিমা'

খুব সচেতনভাবে ঠাকুমা নয়, নানিমার উল্লেখ করেছেন কবি। কবিতার পটভূমি যে ওই সময়। 'হন্তারক মানুষের জান্তব পদচ্ছাপ বুকে নিয়ে শস্যহীন বসন্তের মাঠ।/রক্তাক্ত পাঁকে দেখো মুখ গুঁজে পড়ে আছে আমার হানিফ চাচা.../খোদার মসজিদ আর ঈশ্বরের নামঘর।/মাঝে শতাব্দীর টানা অন্ধকার পথ,/পথের দুধারে ছিন্ন শিশুর শরীর, ভিন্ন/প্রৌঢ়ের শির, দীর্ণ জননীর যুগল উরোজ।/ওদিকে ভরলি আর কলঙসুতি, কপিলি, দিখো—/লুইতের পার ধরে জলের উজানে খাও, জলের ভাটায় যাও,/শ্মশান— শ্মশান।'

অস্বস্তিকর দশক ভাগের প্রবণতা থেকে বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিতকে ষাটের দশকে রাখা যায়। যদিও তাঁর কাব্যচর্চার শুরু পঞ্চাশের দশকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পরবাসী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯-এ। প্রথম থেকেই বীরেন্দ্রনাথ কবিতা লেখার নিজস্ব স্টাইল নির্মাণ করেছেন। তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থের কথা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

তাঁর কবিতার মূল দুটি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই যতিচিহ্ন ও বিশেষণের ব্যবহার। কমলকুমার মজুমদার ও জীবনানন্দের ভক্ত বীরেন্দ্রনাথ যতিচিহ্ন ও বিশেষণ আত্মস্থ করেছেন—

"অল্প-আঁচের নির্জন বোঝাপড়া

শিশুর হাইতোলা শূন্য

ধু ধু ভিড়ের নির্জনতর কালো"

— বিশেষণ এখানে তীব্রতর।

প্রকৃতপক্ষে যতিচিহ্ন হলো বীরেন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম 'যেমন জুড়িয়ে যায়, তেমনি হয়ে এল/ দুধ-ছানার লিকার.../ঠাণ্ডা আর কালো হয়ে। ফুড়ুৎ যখন।'

এখানে দাড়ি, কমা ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো। তাঁর লেখা প্রায় পঞ্চাশ বছরের কবিতায় ইমেজের ব্যবহার ছড়ানো যত্রতত্র—

সূর্যাস্তে গলিয়ে নিও অলস্বল্প সোনার সঞ্চয় অথবা—

মা, সে কবেই তো, কাঁধ-থেকে নামিয়ে রেখেছে মনগড়া মাটির ঘড়াটি

— এরকম ইমেজের ব্যবহারে মুগ্ধ হতে হয়।

এভাবেই বীরেন্দ্রনাথ আমাদের আরও শিক্ষিত করে দিয়ে যান। ছন্দনৈপুণ্য, যতিচিহ্ন, বিশেষণ, ইমেজ, স্বকীয়তায় বীরেন্দ্রনাথ রয়ে গেলেন অম্লান।

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন সচেতনন কবি। প্রখরও বলা যায়, প্রাবন্ধিক রমা পুরকায়স্থের ভাষায় বলা যায়— প্রাকরণিক বিন্যাস দিয়েই তিনি কবিতার সময়কে ধরতে চেয়েছেন। তাই বিষয়ের চেয়েও আঙ্গিক তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতার যখন আধুনিকতার ছাপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছিল, ঠিক তখনই বৃহত্তর বঙ্গসাহিত্যের অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রকরণবাদী শ্রুতি আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক কবিতা-বিশ্ব তাঁকে প্রভাবিত বিচক্ষণ এবং মেধাবী কৃষক যাঁর আছে আশ্চর্য সম্মোহনী ক্ষমতা। প্রবন্ধকার, গল্পকার হিসেবে বিশাল ব্যাপ্তির কাছে বলা যায় তাঁর কবিসত্তা— অসীম আকাশে এক ধ্রুবতারার মতো।

আগুনের কাছে এতো দ্রুত যাবে?

যাও, তবে জলের করুণা

শিখে নিয়ো।

(আবহ, তুমি সেই পীড়িত কুসুম)

.....

এই কৃষ্ণপক্ষে এসো খুঁজি কোথায় মানুষ...

ধর্মের কুহকে নয়, ঘনকালো রাত্রির আবরণে নয়

যেখানে স্বপ্নে স্থাপত্য গড়েছে মানুষের ভাষা

সেখানেই বিনিময় করি হাসি, অশ্রু আর ক্ষমা চাই

মানুষের কাছে যে মানুষ আলোর সন্তান...

(কৃষ্ণপক্ষ)

এমনই বোধিবীজে দীপ্ত এই কবির হৃদয়। তাই প্রাবন্ধিক তপোধীর থেকেও পাঠকেরা চারণ করেন তাঁর কবিতায় বেশি।

সত্তরের দশকে যে সমস্ত কবিরা বরাক উপত্যকার কাব্যভূবণে অনন্য আশাবাদের কুহুকণ্ঠে তেমনি একজন কবি হলেন অমিতাভ দেবচৌধুরী। অমিতাভ দেব চৌধুরী বিভিন্ন স্বাদের কবিতা লিখেছেন যদিও তাঁর কবিতায় 'ইচ্ছেরা মেঘে ঢাকা' থাকলেও 'রৌদ্রেও আহার' আশা করেছে জীবনটা। তেমনি একটি এই কবির কবিতা— যার নাম কেন লিখি'।

পাথরের ভাষা লিখি

জলের লিখনে।

.....

এই সাধ, টের পাই

জলের গহনে।

— প্রতি মুহূর্তে কবি আশাবাদী।

আবার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীকে দশকওয়ারি বিশ্লেষণে নব্বই রাখতে হয়। সঞ্জয়ের প্রথম কবিতা বই 'তরঙ্গতাড়িত' প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। সঞ্জয় 'মহাবাহু' নামে ছোট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্ক নিয়ে যাঁরা লেখালিখি করেছেন বা করছেন সঞ্জয় ওই তালিকায় উপরের দিকে থাকবেন। এবং সঞ্জয় হচ্ছেন বহির্বিশ্বের কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালির মুখ।

ডবকার মেয়েটি কি জানে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা?

শুধু এক্কাদোক্কা খেলে

আর

বাংলাভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে পাঠশালায়।

অথবা ব্রহ্মপুত্রপারের অসমিয়া-বাঙালি সহাবস্থান। সঞ্জয় সঠিকভাবেই লিখেছেন—

'যাদের সঙ্গে আমার দিবস রজনী

তারা জানে না রবীন্দ্রসংগীত?

যেমন আমার ঘরে এখনও বাজেনি

জুবিনের কোনও গীত।'

গোটা দিন কেটে যায় অন্যভাষী মানুষের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথকে জানার কোনো দায় নেই। আর বাঙালি কবির ঘরেও বাজেনি অধুনাবিখ্যাত অসমিয়া গায়ক জুবিন গার্গের কোনো গান। লুইতপারের অসমিয়া-বাঙালিদের সহবাসের কথা সঞ্জয় কখনো ভোলেন না। তাঁর 'একই বাতাস' কবিতায় এই বার্তা বড় নির্দিষ্ট—

'আমি যেমন যাব বিহুতলি, শুনব পার্বতীপ্রসাদের গীত

তুমিও তেমনি হঠাৎ কখনও, শুনে নিও রবীন্দ্রসংগীত।'

সঞ্জয়ের 'শোণিতপুরের রক্তকরবী' ও 'বাবা' প্রায় লোককথায় পরিণত হয়েছে। আশির দশকে লুইতপারে এমন সময় গেছে যে প্রকাশ্যে বাংলা বলতে ভয় পেতেন বাঙালিরা। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির কাছে লুইতপারের বাঙালির অন্তর্বেদনাকে সঞ্জয় অমর করেছে 'আমি একা নির্জন ঘরে' কবিতায়।

গঙ্গাপারের ছেলে মনের আনন্দে খুল্লমখুল্লা, রবীন্দ্র অতুল-দ্বিজেন নজরুল শোনে। আতঙ্ক-ত্রাসের লুইতপারে কোনো বাঙালির ঘরে উপযুক্ত গান বাজলে ধরে নিতে হবে ভুল হয়েছে— 'আমার ঘরেও

চুপে বাজেন, যখন করি ভুল'। মাতৃভাষায় কথা বলতে, গান শুনতে না পারা যন্ত্রণা শুধু পশ্চিমবঙ্গ কিংবা বাংলাদেশ কেন বরাক উপত্যকার কোনো কবির কলমে উঠে আসা অসম্ভব। 'ঈশানকোণ ডট্ কম্' কবিতায় সঞ্জয় খুব নরম সুরে আরেকটা প্রশ্ন করেছেন— তোমাদের 'শুধুই একুশ, উনিশ কি নয়?'

গুয়াহাটিতে যেসব কবি বিস্ময়করভাবে অনালোচিত বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত যদি সেই তালিকার ঊর্ধ্বে থাকেন তবে সুব্রত চৌধুরীর স্থান দ্বিতীয়। অথচ নব্বইয়ের প্রথম দিকেই তিনি সম্পাদনা করেছেন কবিতা বিষয়ক ছোট কাগজ 'পত্রপুট'। এরপর ১৯৯৭ সালে তাঁর কবিতার বই 'শব্দেরা সমবেত কবিতায়' বেরিয়ে গেছে। এমনকি ব্রহ্মপুত্রপারের প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সুব্রতর কবিতা। অসম এবং উত্তর-পূর্বের আকাশ-মাটি-গাছ-মানুষ-নদী-ফুলের কথা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই কবি।

'এবার শীত জাঁকিয়ে পড়েছে

জাটিংগা পাহাড়ে, কমলালেবু ভোর।'

'শীতকাল কবে আসবে, সুপর্ণা'— বাংলা কবিতায় সর্বকালীন জনপ্রিয় পঙ্‌ক্তির মধ্যে অন্যতম। ওই কবিতায় প্রয়াত ভাস্কর চক্রবর্তী সাপের মতো ঘুমোনোর ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। সুব্রত সেসবের ধার ধারেননি। লিখেছেন—

'আবার অপেক্ষায় থেকো

শীত আসবে

আমরাও গাইব উজ্জ্বল

স্বপ্নের গান

এবার পার্কে নয়

ঘন অরণ্যে চলে যাব

হয়তো

অরণ্যে নয়, সমুদ্দুর

চলে যাব

হয়তো চলে যাব সেখানে

যেখানে যায়নি কোনও মানুষ

নির্জন কোনও দ্বীপে'

ব্রহ্মপুত্রপারে এই মুহূর্তেও খুব বেশি নারী কবিতা লিখছেন না। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে শিপ্রা দাস, যদিও তিনি এখন আর তত সৃষ্টিশীল নন। মহিলা কবি কথাটা নেহাতই একটা লঘু তকমা। তবু বলতে হয় দীপিকা বিশ্বাসই সেই প্রদীপ জ্বেলে রেখেছেন। তাঁর এ পর্যন্ত তিনটে কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। 'আমাকে এভাবে ভাবো', 'আমি কোনোদিন বিধবা হব না' এবং 'জীবন যার নাম'। দীপিকার কবিতার মূল উপজীব্য বিষয় প্রেম। প্রেমই মানুষের সঞ্জীবনী শক্তি। এমনটাই তাঁর বিশ্বাস। এবং তাঁর সমস্ত কবিতাতেই

প্রেমই যত্রতত্র খেলা করেছে। তিনি লিখেছেন—

'বাড়ি ফিরে তুমি কার সাথে কথা বলো
চোখ তুলে কাকে দেখাও অসীম ইচ্ছের দহন
কাকে দিতে চাও অকারণ বৃষ্টিপাত
হাতভরা মুখের সন্ধান...'

অথবা

'তুমি এলে, রাত ভরে গেল পূর্ণ অন্ধকারে
দিনের আলোর আর প্রয়োজন রইল না।'

আর তাই কবির প্রেমিক চলে গেলে তাঁর চোখ জলে ভরে যায়, সারারাত চোখের জল ঝরতে থাকে এবং তখন দিনের আলোও ঝাপসা মনে হয়।

'তুমি চলে গেলে
রাত বয়ে যায় চোখের জলে
দিনের আলোয় কিছুই আর চোখে পড়ে না।'

এভাবেই ব্রহ্মপুত্র পারের কবি দীপিকা বিশ্বাস তাঁর কবিতায় প্রেমের জাল বুনে যান। প্রেম ছাড়া আর বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই এই কবির কবিতায়।

আবার বরাক-দুহিতা কবি মেধাবী স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের কবিতায় কান পাতলে শোনা যায়— 'শব্দ আর/শবের ওপর/শুয়ে আছে নিম/নির্মোহ, বীতশোক /তার নিজেকে ভাঙা শেষ/আর নিজেকে গড়া অসম্ভব।' কবির নির্মেদ লেখায় অনিবার্য অমোঘ বড় স্পষ্ট উঠে আসে জননীর মাঝে মানবী সত্তাটি। সেটা বড় সুন্দর তুলে আনেন স্বর্ণালী—

'তবু নিশ্চয় জানি
সিদুঁর টিপের পিছে
ত্রিনয়ন লুকানো রয়েছে।
আসলে ঈশ্বরী তুমি
ভালোবেসে হয়েছো জননী।'

কবি স্বর্ণালীর রোমান্টিসিজম ছুঁয়ে শুনি—

'রাত্রির উপকূলে
জ্যোৎস্নার রূপালি বন্দর
বিছানা-জাহাজ থেকে দেখা যায়

নীল সমুদ্দুর।

সমস্ত আকাশ জুড়ে

মোহনায় আমাতে তোমাতে

একটি দীঘল সেতুয

গড়া যায়, অন্তহীন রাতে।'

বস্তুত, স্বর্ণালী ফেমিনিস্ট কবি। কিন্তু তাঁর কবিতায় ফেমিনিজমের সঙ্গে অন্যান্য শিল্প-বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়।

লুইতপারের সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান কবি নিখিল তালুকদার ইদানীং খুব কম কবিতা লিখছেন। তাঁর জীবনযাপনে কবিতা আর তেমন ধরা দিচ্ছে না হয়তো। জীবিকার তাড়নায় নিখিলকে যেতে হয়েছিল বরাক উপত্যকায়। এখন গুয়াহাটিতেই আছেন। তাঁর প্রকাশিত প্রথম কবিতা বই 'নদী হও বনানী'। দ্বিতীয় কবিতাবই 'আয় বৃষ্টি জোট বাঁধি'।

নিখিলের কবিতায় স্থানিক প্রভাব পড়েছে বিভিন্নভাবে। আর এই উপত্যকার বাইরে থেকে অসমে বসবাস নয়, নিখিল বরাবর ব্রহ্মপুত্র পারের বাসিন্দা। এজন্যেই তিনি লেখেন—

'ঠিকানা আমার একটাই

মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র

লিখে নাও

যদি সময় পাও, এসো।'

পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে অনেকের মুখেই শুনতে হয়, ওখানে থাকা যায় কি? গোলমাল হচ্ছে না তো? শুধু অসমিয়া-বাঙালি নন, বোড়ো, ডিমাসা, কার্বি, মণিপুরি, বিহারি নেপালি পাশাপাশি বাস করেন ব্রহ্মপুত্রের পারে। কখনও উত্তপ্ত হয় কোকরাঝাড়, কখনও আবার কার্বি আংলং, কখনও দাঙ্গা হয় নগাঁও-বরপেটায় ; কিন্তু আমাদের গভীরতা সেসব স্মৃতিকে অতলে তলিয়ে নিয়ে যায়, পরস্পর আমরা আবার বন্ধু হয়ে উঠি। আর নিখিল এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নকারী, সন্দেহ প্রকাশকারী বাঙালিদের জানান—

'এসে দেখে যেও। আমাদের গলাগলি

সহিষ্ণু অবগাহন।'

নব্বইয়ের দশকে বেশ কিছু কবি উত্তরবঙ্গ থেকে জীবিকার তাগিদে লুইতপারে এসে বাসা বাঁধেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম অভিজিৎ চক্রবর্তী। ক্রিকেটের ভাষায় বললে অভিজিৎ চুটিয়ে খেলছেন। কোনো এক সময়ে নাইনথ কলাম পত্রিকার ত্রয়ী সম্পাদকের অন্যতম অভিজিৎ এখনও অপরাজিত। তাঁর সম্পাদিত কাগজ 'কবিতার পূর্বোত্তর' লুইতপারের বাঙালি কবিদের একসময়কার প্ল্যাটফর্ম ছিল। বাঙালি কবিদের কতজন হাইকু লিখেছেন জানি না। তবে অভিজিতের কলমে উঠে এসেছে—

'খামের ওপর নাম লিখতে গিয়ে

নিভে গেল কেরোসিনের আলো

মিথ্যে আর না-বাড়ানোই ভালো...।'

তাঁর একমাত্র কবিতাবই 'অভিজিৎ চক্রবর্তীর কবিতা'। তাঁর কলম আরও শাণিত করে তুলেছেন তিনি। উঠে আসে উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম-অসমের কথকতা—

'এ ছবি বুঝি শেষ চৈত্রে আঁকা?

কী ঝড় উঠেছিল মনে? বরদৈচিলা?'

'সাংসুমা বসুমতারির চিত্রকর্ম' কবিতা এভাবেই শুরু করেছেন কবি। বসুমতারি পদবি থাকলেই বুঝে নেওয়া যায় যে এই ব্যক্তি বোড়ো উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এবং বোড়োদের মধ্যে সাংসুমা অত্যন্ত পরিচিত নাম। কয়েক বছর আগে প্রায় প্রতিদিনই প্রথম পাতায় থাকতো অশান্ত বোড়োল্যান্ডের গল্প।

'সমাগত বৈশাগুর দিনে

দয়িত দূরে ছিল বুঝি?

— অতি দূর, রাষ্ট্র ছাড়িয়ে...'

অশান্ত বোড়োভূমিতে অনেকেই থাকতে পারেননি, রাষ্ট্র ছাড়িয়ে চলে যেতে হয়েছে অনন্ত শয়নে। এখানে দয়িত চলে গেছে রাষ্ট্র থেকে দূরে। তাঁতশালে সাংসুমা বসুমতারি একা একা স্বপ্ন বুনে যায়। নারীহারা, দয়িতহারা এক প্রেমিকা। তাঁর অনুরাগ ঝড়ে এরন্ডায় পাতায়। এবং কবির অনিবার্য প্রশ্ন—

'কত অশ্রু সবুজে মেশালে

এমন হরিদ্রাভ হয় এরন্ডার পাতা?'

বরাকের কবি হেমাঙ্গ বিশ্বাস থেকে শুরু করে আজ অবধি অসমের কবিদের মূল সুর প্রায় একই। কখনও স্থানিকতা, কখনও উদ্বাস্তু-চেতনা। ভাষা আন্দোলন বা প্রেম অথবা পারিপার্শ্বিকতা এগুলো যতজন কবিদের কথা আমাদের গবেষণায় উল্লিখিত হয়েছে— তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছেন। তবে হ্যাঁ একথাও সত্য যে তার ধরণ অবশ্যই এখন পাল্টেছে। আমরা যদি হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কবিতা 'মা, তুমি শিগ্‌গির পিরে এসো' পড়ি, তাহলে দেখবো দীর্ঘ কবিতায় কবি বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, এমনকি খাসিয়া মেয়ের খাসি ভাষাও উল্লেখ করেছেন, এসেছে উমখ্রা নদীর কথা। এসেছে পাইন বন— কিন্তু তাঁর ভাষা কিংবা আঙ্গিক বর্তমানের কবি থেকে অনেকটাই আলাদা। কবি লেখেন—

'প্রয়োজনের বেচা-কেনার হাটে

অপ্রয়োজনের ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে

চড়াই-উৎরাই-ভাঙা ক্লান্ত পসারিনির

ছায়া-বৃক্ষ যেন।

ইবনদি হাসে, গল্প করে ;

ভাষার দুর্বোধ্যতা

ভাবে সহজ হয়।

অনেক অনুরোধে

একদিন ইবনদি গান শোনায়;

শিকারির শর সন্ধানে নিহত

হরিণ শিশুর জন্য

এক হরিণ-মাতার বিলাপ—

কোখুন জঙ্গা সিয়ের লাপালাং...

কোখুন বার্ব্রিউ, কোখুন লাম্‌ফ্রাং...'

এই খাসি ভাষার বঙ্গানুবাদ করেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। লিখেছেন—

'ও আমার জাদুধন

আমার হৃদয়ের রক্ত দিয়ে

যে হৃদয় স্পন্দন তুলেছিলাম

কোন সে শিকারির

নিষ্ঠুর বিষ-তির

তোর সেই কোমল হৃদয়ের রক্ত

শুষে শুয়ে খাচ্ছে ;

ও আমার দুলাল...।'

লক্ষ্য করার বিষয় কবির শব্দ চয়ন, 'জাদুধন', 'দুলাল' ইত্যাদি। আবার কবি লিখছেন ইবনদির অনুভূতির কথা এভাবে—

'ঘরে তার ছোট্ট মেয়ে

নাম তার কাসান্থিউ—

— ফুলকুমারী'

'কাসান্থিউ'-র অর্থ 'ফুলকুমারী' বুঝিয়ে দিয়েছেন কবি। সে মা-কে বেচা-কেনার হাটে যাওয়ার সময় কিছুতেই ছাড়ে না। চোখের জলে বিদায় জানায় মা-কে।

— 'ইম্মেই ওয়ান ক্লোয়

— মা তুমি শিগ্‌গির ফিরে এসো।'

কবি শেষ করেছেন ইবনদির সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাতের কথা দিয়ে। যে সাক্ষাতের পর ইবনদির ক্লিষ্ট দেহ পাওয়া গেছিল। রাত জেগেছিলেন কবি আর কাসাম্বিউ। কাসাম্বিউ তার মা-কে দেখে থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল আর বলছিলো—

— 'ইম্মেই ওয়ান ক্লোয়

— মা, তুমি শিগ্‌গির ফিরে এসো।'

দীর্ঘ কবিতা। পড়তে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ গল্প উঠে আসে। তবে এই গল্পের ভাষা যেন সম্পূর্ণভাবে বাঙালির ভাষা নয়। খাসি মেয়েটির বিলাপ যেন কিছুটা পুরনো ঢঙে। কবিও সন্তানের আর্তিই তুলে ধরেছেন, খাসি ভাষায়, কিন্তু কবিতাটি গল্পের মতো বড়, এটা বরং গদ্য ছন্দে একটা ভারি সুন্দর গল্প হতে পারত।

আবার এইরকম আর্তি লুইতপারের কবি সঞ্জয় চক্রবর্তী তাঁর 'বাবা' কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবিতাটি দীর্ঘ হয়েও, গদ্যছন্দের হয়েও কিন্তু এই একুশ শতকের বাঙালির কাছেও কবিতা হয়ে রয়েছে। কারণটা অবশ্যই সময়। সময়ের সঙ্গে স্বাদ পাল্টেছে। পাল্টেছে কবিতা লেখার স্টাইলও। সঞ্জয় এগারোটা স্তবকে কবিতাটিকে ভাগ করেছেন, লিখছেন—

'মুখাগ্নি করিনি,

আগুন ছুঁইয়েছি কাঠে।

ব্যথায় যদি কেঁপে ওঠো

থরথর!'

— এ যেন আজকের প্রতিটি পিতৃহারা ছেলের কথা। যেখানে নিয়ম-কানুন ছাড়াও এক তরুণ ছেলের আর্তি রয়েছে। তাই সেই তরুণ ছেলে বাবার মৃতদেহে নিয়ম মেনে 'হরেকৃষ্ণ' লেখে না— বরং

'চুম্বন এঁকেছি

কপালে ও ঠোঁটে।'

সে হিন্দু নিয়মে তার বাবাকে শেষ স্নানও করায় না। স্নান করায় তার নিজের নিয়মে। এক পুত্রের নিয়মে—

'তারা স্নান করালো তোমায়

গন্ধ, চন্দন, ঘৃতে।

আমি,

অশ্রুজলে, নিভৃতে।'

— তরুণ ছেলের অশ্রুও মানুষের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, তাই কবি জ্ঞাতসারেই 'নিভৃতে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

এই ছেলেকে তার পিতৃদেহ কাঁধে তুলে নিতে শ্মশানে। আর এই পিতার কাঁধেই তার বাল্যকাল

কেটেছে। তাই কবি সচেতনভাবে লেখেন—

'কাঁধের অপর নাম বহন
ঘোড়া-ঘোড়া খেলায়
যে বহন করে
সন্তানের নির্মল হাসি
একদিন সেই কাঁধ
বয়ে নিয়ে যায় পিতার শব।'

কী সকরুণ আর্তি। মা-হারানোর যে আর্তি হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন, একই আর্তি সঞ্জয়ের বাবা-হারানোর। কিন্তু তফাৎ অনেক। কারণ একটাই হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর সময়ের মতো করে মা-হারানোর আর্তি তুলে ধরেছেন।

আর সঞ্জয়-এর কবিতা এই একুশ শতকের মানুষের মনের কথা, মুখের ভাষা। বস্তুত, সময় বা প্রেক্ষাপট কবির কাব্য নির্মাণের দেহ। আর তাই এই তফাত।

কবিতাকে সময় বা স্থান-কালের নিরিখে বিভাজন করা না গেলেও অসমের কবিতা তার আঙ্গিক, চিত্রকল্প, বৈশিষ্ট্য সমস্ত কিছু নিয়ে বাংলা কবিতার মূল স্রোত থেকে অনেকটাই আলাদা। আর তাই হয়তো অসমের কবিতা এখনও কোনো গবেষকের গবেষণার বিষয় হতে পারেনি। সেজন্যেই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াসে আমরা অসমের বাংলা কবি ও কবিতাকে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি। তবে একটা কথা, অসমের কবিতাকে উদ্বাস্তু-চেতনা, বরাকের ভাষা-আন্দোলন একটা অন্য মাত্রা দিয়েছে। তবে ব্রহ্মপুত্রের পারে অসম-আন্দোলন বা 'বঙাল খেদা' আন্দোলন যে উত্তর-পূর্বের কবির কলমেই উঠে আসতে পারে তা বলাটা এহো বাহ্য। উদ্বাস্তু-চেতনা কবিতায় সেভাবে না হলেও ছড়িয়ে আছে বাংলা গল্পে-উপন্যাসে। কিন্তু অসম-আন্দোলন শুধু লুইতপারের কবি, গল্পকার কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবির কলমেই উঠে এসেছে। তাই ত্রিপুরার শক্তিমান কবি প্রবুদ্ধসুন্দর কর লেখেন—

'আমার দুচোখ ধুইয়ে দিয়ো লুইতের জলে
আমার দুচোখ সারিয়ে তুলুন শ্রীময়ী কস্তুরী
পুরোপুরি দৃষ্টি ফিরে এলে দেখে যেতে চাই
উমানন্দ পাহাড়ের চূড়ায় নীলিম কুমারের
শ্রেষ্ঠ কবিতায় বই হাতে
ব্রহ্মপুত্রের দিঘল বাঁক বাঁক দেখতে দেখতে
ফুঁপিয়ে উঠছে অনুতপ্ত পরেশ বরুয়া।'

'ডি. এন. এ টেস্টের পর পুনরাবিষ্কৃত হবে

কেউ বাংলাদেশি নয়, অসমিয়া নয়।
বাঙালিও নয়।
জন্মযাযাবর প্রতিটি মানুষ
ভূপেন হাজরিকার কণ্ঠদেশে আপাতত আশ্রয় নিয়েছে।'

'যাকে কবি ভেবে বসে আছ
অতিনিরীহের ছদ্মবেশে সেও একটি মানববোমা
তার মাথার ভেতর নিষিদ্ধ রন্ধনশালা।
রচনা বিষাক্ত, এই ভয়ে রাষ্ট্র তাকে চোখে চোখে রাখে।
উৎসবের টেবিল, পানিকাউরি, বিধুরলণ্ঠন
সুগন্ধি পখিলা আর বিষাদবালক
কংগ্রেস-অগপ-আলফা-সালফানিরপেক্ষ
একেকটি বিস্ফোরক কোড।
রক্তপাতহীন যেগুলোর নাশকতা
মালিগাঁও, পানবাজার কিংবা গণেশগুড়ির চেয়েও অতিতেজস্ক্রিয়।'

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবি না হলে এ কথা এত জলবৎ তরলং ঢঙে কোনো কবি লিখতে পারেন না। আর তাই এ অঞ্চলের কবিতা খানিকটা হলেও বাংলা কবিতার মূল স্রোতের চেয়ে কিছুটা আলাদা। কারণ এখানকার বাঙালি কবিরা বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর প্রকাশ্যে নিজের মাতৃভাষায় কবিতা লেখার সাহস করেছেন। ফলত, তাঁদের রূপক, ব্যঞ্জনা অনুভূতি শিরা-উপশিরায় এই অঞ্চলের রক্ত প্রবহমান।